ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নতুন বাংলাদেশ’
কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

১৮ নভেম্বর ২০২৪

‘নতুন বাংলাদেশ’: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*
মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো*
মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*

তথ্য সংগ্রহ
ইসরাত রুবাবা তাহসীন, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*
আসিফ করিম চৌধুরী, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তার জন্য ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। গবেষণার ধারণাপত্র তৈরিতে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি’র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। এই গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রিসার্চ ও পলিসি এবং অন্যান্য বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বছরের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৯ জন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য। এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে "'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ১০০ দিনে সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত ও বিচার, আর্থিক খাত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এসব সিদ্ধান্ত/ উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার অংশ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়নের সুযোগ নেওয়া হয়নি বলে দেখা যায়, যা এখনো অনুপস্থিত। আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার বিচার প্রক্রিয়ায় অব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। সুনির্দিষ্ট ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক মামলা দায়ের করার উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ঢালাওভাবে শত শত মামলায় শত শত ব্যক্তিকে আসামী করার ফলে মূল অপরাধীর উপযুক্ত বিচারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

পদত্যাগের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন পুনর্গঠনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনসমূহের কার্যক্রম চলাকালীন অব্যবস্থা লক্ষণীয়। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও দায়িত্ব বণ্টনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হয়েছে। প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি দেখা যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারে দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দেখা যায়। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে, যদিও দলীয়করণের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত বিধায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি বাড়ছে বলে শঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে এক দলীয়করণের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের উদ্বেগ বিদ্যমান। পদোন্নতি/ পদায়নকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা গেছে।

কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও রাজনীতি থেকে নিবৃত থাকার ভূমিকাও ইতিবাচক। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার প্রশ্নে কোনো কোনো মহলের ধৈর্যের ঘাটতি লক্ষ করা যায় - তিন মাসেই সরকারের কার্যক্রম নিয়ে কোনো কোনো মহল হতাশা প্রকাশ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দলবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান দেখা যায়, যা একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও দলীয়করণের পরিবর্তে আরেকটি দলীয়করণের প্রতিস্থাপন/ হাতবদল বলে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি, যা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। বিএনপির পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন লক্ষ করা যায় - প্রথমে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার কথা বললেও পরবর্তীতে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি তুলেছে দলটি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান - অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার রাষ্ট্র সংস্কার হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান ও রাজনৈতিক সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন এবং বিভাজনের লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়।

কোনো কোনো গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলাসহ একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা, অন্যদিকে অনেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা এবং নির্বিচারে অ্যাক্রিডিটেশন বাতিলের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকি হিসেবে গণ্য করা যায়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়।

ভারত কর্তৃক কর্তৃত্ববাদ পতনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকারে ব্যর্থতার পাশাপাশি বরং উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করতে ভারত থেকে পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড লক্ষ করা গেছে। সর্বোপরি ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন সরকার ও দেশের জন্য উদ্বেগজনক। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রভাবশালী দেশ ও দাতা সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার আশ্বাস ও ঘোষণা এই সরকার তথা আন্দোলনের অভীষ্টের প্রতি আস্থার প্রকাশ। তবে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফ এর মতো সংস্থার ঋণ সহায়তা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও বিশেষ করে ইতোমধ্যে সুদসহ ঋণের ভারে জর্জরিত দেশবাসীর ওপর অতিরিক্ত বোঝার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান ও মো. মোস্তফা কামাল। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাদেরকে সহায়তা করেছেন ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরী। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। গবেষণার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজন উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

‘নতুন বাংলাদেশ’
কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

গণ-আন্দোলনের ফলে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অর্জন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বছরের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৯ জন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য। এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি’র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘নতুন বাংলাদেশ’: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ’ শীর্ষক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহ ও অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত রাষ্ট্র সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
২. রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৩. সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হচ্ছে - রাজনৈতিক প্রেক্ষিত; প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার; আইনের শাসন ও মানবাধিকার; অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা; গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার; স্থানীয় সরকারব্যবস্থা; এবং অন্যান্য খাত, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ ও অভিবাসন।

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের সংস্কার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট হতে উৎস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় আগস্ট - নভেম্বর ২০২৪ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের সময় ছিল কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে ১০০ দিন (২০২৪ এর ৫ আগস্ট থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত)।

গবেষণার ফলাফল

অন্তর্বর্তী সরকার

১. রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার ও নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যেসব রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে সেগুলো হচ্ছে গণ অধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, এবং এবি পার্টি। আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচার না হওয়া পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের (আওয়ামী লীগের) পুনর্বাসন না করা, মানবতাবিরোধী অপরাধী হিসেবে তাদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু, ফ্যাসিবাদী দল ও জোটকে প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালনের সুযোগ থাকবে না মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে। গণভবনকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৭ মার্চসহ আটটি জাতীয় দিবস উদযাপন বা পালন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ৩৩টি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; এর মধ্যে ২৭টিতে ছাত্ররাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চারটি ব্যাংকনোট থেকে শেখ মুজিবের ছবি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা বা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হচ্ছে তা এখনো বিতর্কিত। বিভিন্ন গোষ্ঠী আটটি জাতীয় দিবস পালন না করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য পেশা ও প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি বিষয়ে কোনো অবস্থান লক্ষ করা যায়নি।

২. প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

নিয়োগ ও রদবদল

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও পদের মধ্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য) ও কলেজ (অধ্যক্ষ), ব্যবসায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক (গভর্নর, উপদেষ্টা, বিএফআইইউ এর প্রধান), এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশন, ক্রীড়া সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে পদোন্নতি, পদায়ন, বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা, এবং চুক্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২, এবং বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ চার বার অবতীর্ণ হতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একদিকে পিএসসি থেকে নিয়োগের সুপারিশ পেয়েও বিগত সরকারের সময়ে চাকরি না পাওয়া ২৫৯ চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও ৯৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিতর্কিতভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া ছয়টি বিসিএস ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলমান।

দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও পদত্যাগের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা হয়েছে। নিয়োগে বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া বা না দেওয়ার চর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সংস্কারের উদ্যোগ

অন্তর্বর্তী সরকার দুই পর্যায়ে দশটি বিষয়ভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। প্রথম পর্যায়ে জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন, এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারবিষয়ক কমিশন ও দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার, নারীবিষয়ক কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঠিত কমিশনগুলোর কার্যক্রম চলমান হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের কমিশনগুলো এখনো পুরোপুরি গঠিত হয়নি। এছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণে আইনি কাঠামো ঠিক করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কমিটির সুপারিশের আগেই শেখ পরিবারের নামে প্রতিষ্ঠিত ২০টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা খাতসহ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য থাকার সমালোচনা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিশন বা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপের মুখে পদত্যাগ করায় স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে; সংস্কার কমিশনের কাজ শেষ না হতেই নতুন নিয়োগের উদ্যোগ বাধ্যতামূলক বিবেচনা করা (নির্বাচন কমিশন, দুদক) সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা খাতের সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। সংস্কার কর্মসূচিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকেও যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

জনপ্রশাসন

জনপ্রশাসনে সংস্কারের অংশ হিসেবে পতিত সরকারের সময় দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি (৫০১), নিয়োগ/ বদলি (২৮৫), সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) এর মাধ্যমে নিয়োগ/ পদোন্নতি (২২১), প্রেষণে নিয়োগ/বদলি (৪৭৩) করা হয়েছে। পদোন্নতি ও পদায়নকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার করা হয়েছে একাধিকবার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (জিইএমএস) আওতায় সহকারী সচিব থেকে সচিব/সিনিয়র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৮৫০ এর বেশি কর্মকর্তাদের তালিকা যাচাই-বাছাই চলমান।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এ পর্যন্ত ২৭ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সচিব পদে নতুনদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার ঘাটতি, মাঠ পর্যায়ে প্রশাসকের পদায়নে বিলম্ব (বিভাগ ও জেলা প্রশাসক), যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য নোটিশ করা হলেও এসএসবির সভা চার মাস ধরে স্থগিত, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রায় বন্ধ থাকা, ইত্যাদি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ধীরগতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে, যেমন বগুড়ার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে যোগদানের পরই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাড়ি পরিদর্শন, এবং সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক পোস্ট দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতি। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বলেও দেখা গেছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত, এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। চুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে গত সরকারের আমলে বঞ্চিত ও পদোন্নতি প্রত্যাশী কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। এছাড়া পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগও উঠেছে। সার্বিকভাবে জনপ্রশাসনে কর্মসম্পাদনে পেশাদারিত্বের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া কর্মকর্তাদের বিতর্কিত কার্যক্রমের কারণে গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য লক্ষ করা যায়। আমলাতন্ত্রে পতিত সরকারের দোসরদের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩. আইনের শাসন ও মানবাধিকার

আন্দোলনে হতাহতদের সহায়তা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার

জুলাই ও আগস্টের শুরুতে দেশে ঘটে যাওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধসহ ১৫ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল কাজ শুরু করেছে। নভেম্বরের শেষে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল ও তারপর প্রকাশ করার কথা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতের সংখ্যার খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত বা পরবর্তীতে শহীদ ব্যক্তির আইনসম্মত ওয়ারিশদের মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৩০ থেকে ৪০ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে যা কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তা ও পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে, এবং এই ফাউন্ডেশন থেকে ১৭৬ জন আহতকে মোট ১ কোটি ৭১ লাখ ৪২ হাজার ৫০ টাকা অনুদান (১৩ অক্টোবর পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছে। নিহতদের পরিবারের কোনো কোনো সদস্যকে চাকরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) সারা দেশে দায়ের করা প্রায় সব হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেফতার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানে বল প্রয়োগ ও হতাহতের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে, এবং অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। তবে হতাহতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে, এবং সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য লক্ষ করা যায়। গণ-অভ্যুত্থানে শহীদের পরিবার পুনর্বাসন এবং সকল আহত শিক্ষার্থী ও জনতার চিকিৎসার ব্যয় বহনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ার অভিযোগে আন্দোলন হয়েছে। চিকিৎসার অপর্যাপ্ততা ও ক্ষতিপূরণ না পাওয়া নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ হয়েছে। এছাড়া দায়মুক্তির সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

সারণি: সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য

প্রতিষ্ঠান	নিহত	আহত
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৮৭২	১৯,৯৩১
সংবাদপত্র	৭৬৭	২২ হাজারের বেশি
হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি	৯৮৬	৩০ হাজারের বেশি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি	১,৫৮১	৩১ হাজারের বেশি

গণহত্যায় জড়িতদের বিচার প্রক্রিয়া

সাবেক সরকারের বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেখা যায় ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ২১৩টি হত্যা মামলা। বেশির ভাগ মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের আসামি করা হয়েছে। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ১,৬৯৫টি মামলা করা হয়েছে, এবং এসব মামলায় ৩,১৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে (১৩ অক্টোবর পর্যন্ত), যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ৭৪ জন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে সহিংসতার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৮০টির বেশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে (৪ নভেম্বর পর্যন্ত)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, এবং ১৮ নভেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনাসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে এই ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এসব শাস্তির মধ্যে রয়েছে সাময়িক বহিষ্কার, ক্লাস ও পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বিরত রাখা।

দেখা যাচ্ছে জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হচ্ছে, এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া হচ্ছে। এসব মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যেখানে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামির করা হচ্ছে, আবার অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া গত সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি পরিলক্ষিত হয়েছে - এককজনকে একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। পুরনো ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডও বহাল রয়েছে বলে দেখা যায়।

আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান বলে লক্ষ করা যায়। বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কয়েকটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে - এর মধ্যে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ, এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধন না করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। সরকার-পতনের অব্যবহিত পরের কয়েকদিন সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ছিল, যে কারণে অনেক থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছে। পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে।

আন্দোলনে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শুধু ঢাকাতেই পুলিশের কমপক্ষে ৯৯ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা হয়েছে। পুলিশকে সক্রিয় করা ও দলীয়করণমুক্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। তবে একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশের অনুপস্থিতি, এবং পরবর্তীতে নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর সারা দেশে ছয় শতাধিক নিহত ও ১০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। গণপিটুনির ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে বলে লক্ষ করা যায় - গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৯০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। এছাড়া চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশের নয়টি কারাগারে বিক্ষোভ ও সহিংসতায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে, অনেক বন্দী পালিয়ে গেছে যাদের একটি অংশকে এখনো আটক করা যায়নি। শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা দেখা গেছে। বকেয়া বেতন পরিশোধ ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে তৈরি পোশাক ও ওষুধ শিল্প-কারখানায় বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছে। গাজী টায়ার কারখানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগে মৃত্যু ও নিখোঁজ কমপক্ষে ১৭৫ জন। এছাড়া সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক সহিংসতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে, এবং ঘরবাড়ি, যানবাহন ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী (সুব্রত বাইন, 'পিচ্চি হেলাল', 'কিলার আব্বাস') কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আরেকটি দিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়া। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-আদিবাসীদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। ঐক্য পরিষদের হিসাব অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ২,০১০টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেছে যেখানে ৯ জন নিহত হয়েছে; অন্যদিকে একটি সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী ১,০৬৮টি স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় মিলিয়ে ৫০টির বেশি মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যেসব ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দেশের ২২টি জায়গায় শিল্পকলা একাডেমিতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে; প্রতিবাদের মুখে শিল্পকলায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয়েছে। এছাড়া মেলা আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একজন অভিনেত্রীর একটি বিপণিবিতান উদ্বোধনে বাধা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন গোষ্ঠী/ শ্রেণি-পেশার বিভিন্ন দাবিতে বেশ কয়েকটি আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে সচিবালয় ঘেরাও করে আনসার সদস্যদের বিক্ষোভ, এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন, এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন, কয়েকজন কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি, এবং চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের চার দফা দাবিতে কর্মবিরতি উল্লেখযোগ্য। এসব আন্দোলনের কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মোকাবিলা করার জন্য পুলিশের সহায়ক হিসেবে প্রথম দফায় রাজধানীসহ সারা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এবং পরবর্তীতে নৌ ও বিমান বাহিনীকে দুই মাসের জন্য বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরও দুই মাসের জন্য এই বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়। পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), যৌথ বাহিনী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে গত দুই মাসে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে ঢাকাসহ দেশের ১২টি জেলায় যে ১২৬ জন অস্ত্রধারীকে শনাক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

জুলাই-আগস্ট সময়ে গণহত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে যা তাদের পেশাদারিত্বের ঘাটতিকে নির্দেশ করে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রান্তিক ও ভিন্নমতের জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ীদের চিহ্নিত করা, তদন্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এছাড়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সামরিক বাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করলেও জবাবদিহি কার কাছে তা পরিষ্কার করা হয়নি। বিভিন্ন বাহিনীর অভিযানে বিচারবহির্ভূত হত্যা চলমান রয়েছে বলেও দেখা যায়।

মানবাধিকার

অন্তর্বর্তী সরকার গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স (আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করেছে। গুমের বিষয় তদন্ত ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন 'আয়না ঘর' থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করলেও ডিজিএফআই ও পুলিশের বিরুদ্ধে আয়না ঘরের আলামত নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তীতে গত দেড় দশকে মানুষকে তুলে নিয়ে গুমের ঘটনায় গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনে ১,৬০০টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে। ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় করার জন্য আলোচনা হলেও পরবর্তীতে তা এখন সম্ভব নয় বলে জানানো হয়।

এই সরকার মানবাধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় করা নিয়ে উপদেষ্টাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বিচার বিভাগ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের ধারাবাহিকতায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা পদত্যাগ করেন। দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়। বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় ১৭ জন স্পেশাল পিপির নিয়োগ বাতিল করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রধান বিচারপতি ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন।

উচ্চ আদালতের রায়ে বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নানা কারণে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অন্যদিকে সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মানহানির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মহাসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালাস দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিচারক নিয়োগের বিধিমালা হয়নি; এটি হওয়ার আগেই আইন কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

৪. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বেশ কিছু উদ্যোগ/ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে দেখা যায়। যেমন সাবেক সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুদক তদন্ত শুরু করেছে। সাবেক ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৭৯ জনের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান চলমান। এছাড়া বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত মাত্র দুইটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে, এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগসংক্রান্ত দুর্নীতির বিষয়ে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর পক্ষ থেকে প্রায় ৫০ জন সন্দেহভাজন, তাদের পরিবারের সদস্য ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভুয়া সনদ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের পদত্যাগ করার পরে সংস্কারের আগেই এসব পদে নিয়োগের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।

একজন বিচারপতির দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চটি ভেঙে নতুন করে বেঞ্চ গঠন করেছেনে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তায় ব্যয় নিরূপণ, সম্পত্তি ও সুবিধাদির বিষয়ে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

'অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪' জারি করার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীর পৃথক আয় থাকলে তার বিবরণী ও জমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরম্যাটের মাধ্যমে সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদেরকেও সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও দুদকের কার্যক্রমের সমালোচনা রয়েছে। সাবেক সরকারের সময় দুদকের নিষ্ক্রিয়তা এই প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, সদিচ্ছার ঘাটতি, এবং দুদকের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা প্রকাশ করে। এর মধ্যে দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ পদত্যাগ করার ফলে সংস্কারের আগেই এসব পদে নিয়োগের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কারের আগেই দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্যোগের ফলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়াও দুদকের চলমান অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ। সংস্কারের আগেই দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্যোগের ফলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

৫. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

কর্তৃত্ববাদী সরকার একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি রেখে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরিতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের (রি-স্ট্র্যাটেজাইসিং দ্য ইকোনমি অ্যান্ড মোবাইলাইজিং রিসোর্স ফর ইকুইটেবল অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং একটি ন্যায্য, টেকসই ও গতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি। এই টাস্ক ফোর্সের ২০২৪ এর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরির কথা।

রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এবং অর্থনৈতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সাতটি চলমান মেগা প্রকল্পের যৌক্তিকতা পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প হচ্ছে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, এবং চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ও স্বল্প ব্যয়ে মেট্রোরেল চালু সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

তৈরি পোশাকশিল্পের ক্রমাগত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মাসিক হাজিরা বোনাস, টিফিন ও রাত্রিকালীন ভাতা বৃদ্ধি, নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ ১৮ দফা বাস্তবায়নে মালিকপক্ষ সম্মতি দিলেও তৈরি পোশাকশিল্পে বিশৃঙ্খলা এখনো চলমান। সরকারের শুরুর দিকে সঙ্কট থাকলেও ধীরে ধীরে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ১ হাজার ৫৭৯ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৮ শতাংশ বেশি। তবে আন্দোলন ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রায় ৪.৭৫ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে; এডিপি বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৩,২১৫ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা কম।

ব্যাংক খাত সংস্কার

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে নতুন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয় ও পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। ব্যাংক খাত সংস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে সাবেক সরকারের সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের অপসারণ করার মাধ্যমে একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাত থেকে ছয়টি ব্যাংক উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর শেয়ার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তবে ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন করার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারে লাগাম তুলে নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এবং বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া, চাল, পেঁয়াজ ও আলুর আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস ও প্রত্যাহার, এবং ডিম উৎপাদক বড় কোম্পানি ও ছোট খামারিরা সরকার নির্ধারিত দামে সরাসরি পাইকারি আড়তে ডিম পাঠাবে বলে সিদ্ধান্ত। এছাড়া ঋণপত্র বা এলসি মার্জিন ছাড়াই নিত্যপণ্য আমদানি করা যাবে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান খাদ্য, নিত্যপণ্য ও সার আমদানি করে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার কোনো সীমা থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে সুদের হার ও ডলারের দামের কারণে নিত্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এখনো সম্ভব হয়নি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি।

রাজস্ব সংগ্রহ

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংস্কারে পাঁচ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর আইন ২০২৩ পর্যালোচনা এবং সংস্কার প্রস্তাবের জন্য সাত সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ আনুষ্ঠানিভাবে বাতিল করা হয়েছে। নগদ অর্থ, বন্ড বা সিকিউরিটিজ, আমানত, আর্থিক স্কিম ও যন্ত্রপাতিসহ সম্পদের ওপর ১৫ শতাংশ কর দিয়ে অবৈধ আয়কে বৈধ করার বিধান বাতিল করা হয়েছে। তবে ফ্ল্যাট ও জমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ এখনো বিদ্যমান। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের শীর্ষস্থানীয় পাঁচজন ব্যবসায়ীর কর ফাঁকি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের আওয়ামী লীগের আমলে বাতিলকৃত কর অব্যাহতি সুবিধা এবং আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনকে কর অব্যাহতি সুবিধা ২০২৯ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।

চলতি ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজীকরণের লক্ষ্যে এনবিআর-এর অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনলাইনে আয়করের ই-রিটার্ন জমার সংখ্যা ২ লাখ অতিক্রম করেছে। চার সিটি করপোরেশনে অবস্থিত আয়কর সার্কেলের অধিভুক্ত সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকার, মোবাইল প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ছয়টি বড় কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) শুল্ক-কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৩০ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা। কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি এনবিআর। এমনকি আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর, এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

শেয়ারবাজার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি পুনর্গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারের দরপতনের কারণ খুঁজতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের শেয়ারবাজার কেলেংকারির জন্য দায়ী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সালমান এফ রহমান ও এস আলমের শেয়ারবাজারে অনিয়মের তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। শেয়ারবাজারকে প্রণোদনা দেওয়ার অংশ হিসেবে মূলধনি মুনাফার কর হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও শেয়ারবাজার এখনো অস্থিতিশীল।

৬. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার

ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহবান জানান প্রধান উপদেষ্টা। গণমাধ্যমের সংস্কারের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ ও সময়ে সময়ে মামলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন বা এর পূর্বসূরি সব মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া সাইবার আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত (মুক্তমত প্রকাশের কারণে মামলা) মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও প্রধান উপদেষ্টা, তথ্য উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্য ও হত্যার হুমকি দেওয়া, কটূক্তি করার অভিযোগে এই আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব মামলায় কোনো পদক্ষেপ না নিতে এবং কাউকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। অন্যদিকে সরকারের দোসর ও আন্দোলনের বিরোধিতা করার অভিযোগে ঢালাওভাবে ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

তবে এই সময়েই গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলাসহ কোনো কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা লক্ষ করা যায়, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকিস্বরূপ। সাইবার নিরাপত্তা আইনে ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে মামলা কেন নেওয়া হলো তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

৭. স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ৪,৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১,৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল বলে দেখা যায়। জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা হয়েছে। পরবর্তীতে সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র - স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে সব মিলিয়ে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়েছে। তাদের জায়গায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম কেন্দ্রীয় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ সিটিতে সব নিবন্ধনের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে জমা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভাতার তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের পুনরায় যোগ্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, এবং সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ বেড়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা বিঘ্নিত হয়েছে।

৮. অন্যান্য খাত

শিক্ষা

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর সরকারি ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে এখন পর্যন্ত ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আন্দোলনের প্রভাব কাটিয়ে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি, গণরুম প্রথা বাতিল করা হয়েছে, এবং নিয়মতান্ত্রিক আসন বরাদ্দ করা শুরু হয়েছে।

দুজন সদস্যকে নিয়ে কিছু ধর্মভিত্তিক সংগঠনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। সমন্বয় কমিটি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০১২ এর পাঠ্যক্রমে ফিরে যাওয়া, মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা পুনর্বহাল, অর্ধবার্ষিকীর বাকি মূল্যায়ন না করা ও বার্ষিক পরীক্ষায় পূর্বের মতো লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি নীতিমালা ২০২৪ জারি করা হয়েছে, যেখানে এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও বেসরকারি স্কুল-কলেজের বেতন/টিউশন ফি ছাড়া অন্য সব ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথমে এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে। তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এইচএসসির কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তারপর আবার এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াদের পাস করিয়ে দেওয়ার দাবিতে কিছু শিক্ষার্থী আন্দোলন করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখার উদাহরণ দেখা যায়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষা একটি অগ্রাধিকার খাত হলেও এবং শিক্ষাবিদদের সুপারিশ সত্ত্বেও এ খাতের সংস্কার সংক্রান্ত কোনো কমিশন এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

স্বাস্থ্য

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ক কমিটি গঠন করা হলেও কমিটি থেকে সভাপতি পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও এটি এখনো কাজ শুরু করেনি। একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে জেলার নামে দেশের ১৪টি হাসপাতাল ও ছয়টি মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে বিশৃঙ্খলা চলমান।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০ এর অধীনে নতুন করে কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই আইনের অধীনে গৃহীত বিদ্যুৎ-জ্বালানির চুক্তি পর্যালোচনায় দুইটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০-এ দায়মুক্তি ও মন্ত্রীর একক ক্ষমতা-সংক্রান্ত বিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে উচ্চ আদালত। এছাড়া নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারত থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বাংলাদেশ-ভারত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমদানি করা এলএনজি রূপান্তর করে সরবরাহের জন্য পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেটের সঙ্গে সই হওয়া টার্মশিট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে প্রস্তাবনা, উদ্যোগ ও প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার।

অন্যদিকে সময়মতো পরিশোধ করতে না পারার কারণে আদানি পাওয়ারের পাওনা রয়েছে ৮৪৬ মিলিয়ন ডলার। আদানি পাওয়ারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। দেখা যাচ্ছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের করা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের আইন ও বিভিন্ন চুক্তির কারণে আর্থিক ক্ষতি ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহে ঝুঁকি প্রকট হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণে কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বনভূমি ও বন সংরক্ষণের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ এবং অবৈধ চিংড়িঘের উচ্ছেদ করতে আদালতের নির্দেশ, কক্সবাজারে লোক প্রশাসন একাডেমির জন্য অনুমোদিত ৭০০ একর 'রক্ষিত' বনভূমির বরাদ্দ বাতিল, এবং মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলা সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেন্ট মার্টিনে পর্যটন নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৭টি একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের তালিকাসংবলিত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সব সরকারি দপ্তরে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সব সুপার শপে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশের সব আদালত প্রাঙ্গণে হোটেল, রেস্তোরাঁয় তালিকাভুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে বিকল্পের ঘাটতির কারণে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারের বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে আরব আমিরাতে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ৫৭ জন প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে বিশেষ ক্ষমা পেয়ে দেশে ফেরত এসেছেন। তাঁদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ চালু করা হয়েছে। বিদেশে কর্মী পাঠাতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ অনুমতির প্রয়োজন নেই বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা হিসেবে 'ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড'-এ বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ১ কোটি টাকা প্রত্যাহার, এবং বিদেশি মালিকানাধীন শিপিং বা এয়ার ওয়েজ কোম্পানির বিদেশস্থ অফিসে চাকরিরত অনিবাসী বাংলাদেশি নাবিক (মেরিনার), পাইলট ও কেবিন ক্রুদের জন্য ওয়েজ আর্নার বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। দেখা যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর সময়ে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে ৮.৯৩ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের (৬.৮৭ বিলিয়ন ডলার) তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি।

সেনাবাহিনী

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার/ ঘোষণা দেন সেনাপ্রধান। এছাড়া সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে রদবদল করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেনা কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বেসামরিক প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেনাবাহিনী।

তবে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যাশিত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি ছিল। এছাড়া নির্বাচনের সময়সীমা বিষয়ে সেনাপ্রধানের ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা হয়।

রাজনৈতিক দল

গণ-আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এসব রাজনৈতিক দলের কয়েকটির ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের জন্য সরকারের সাথে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে বিএনপি। সংবিধানসহ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত ছয়টি কমিশনের আলোকে ছয়টি ছায়া কমিটি গঠন করেছে। এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করে আসছে।

তবে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের কৃতিত্ব দাবি করেছে বিএনপি। আন্দোলনে নিহতদের মধ্যে ৪২২ জন বিএনপির বলে দাবি করে। বিভিন্ন সময়ে সরকারের সমালোচনা করেছে বিএনপি। এসব সমালোচনার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে অস্পষ্টতা; নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা না করা; প্রশাসনিক কার্যক্রমে 'ধীরগতি'; দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা; প্রশাসনে পুরো শৃঙ্খলা ফেরাতে না পারা; জুলাই-আগস্টে শহীদ ও আহতদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে না পারা; সংস্কারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা না থাকা; কী পরিবর্তন করবে-সে বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং দলের নেতা-কর্মীদের কোনো ধরনের বিতর্কিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই নির্দেশ সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে বলে দেখা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, হামলা, চাঁদাবাজি, দখল, আধিপত্য বিস্তারে সংঘর্ষ ও হাঙ্গামা উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ১,০২৩ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা, কমিটি থেকে অব্যাহতি, কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান।

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন), সড়ক পরিবহন খাতে দখল ও আধিপত্য বিস্তার করে বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা। এছাড়া বিএনপির সমর্থক ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য এবং প্রতিপক্ষ দলের সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ ও সহিংসতার অনেকগুলো ঘটনাও ঘটেছে।

দেখা যাচ্ছে, দলের মধ্যে দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান। সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন এবং নির্বাচনের সময় নিয়ে রোডম্যাপের দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। দলের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের সংস্কারে সরকারের জন্য ১০ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এই ১০ দফার মধ্যে রয়েছে আইন ও বিচার, সংসদবিষয়ক সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা সংস্কার, র‍্যাববিষয়ক সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, দুর্নীতি, সংবিধান সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার, পররাষ্ট্রবিষয়ক সংস্কার, এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় সংস্কার। এছাড়া ইসলামপন্থীদের নিয়ে নির্বাচনী ঐক্যের জন্য বিভিন্ন ইসলামী দল ও আলেমদের সঙ্গে বৈঠক করছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় শিবিরের প্রকাশ্য কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে।

ধর্মান্ধ বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে ধর্মীয়, জেন্ডার, জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক ও লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ঝুঁকিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা যায়। হিযবুত তাহরীরের মতো দলের প্রকাশ্য কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে। এছাড়া ডিজিটাল মাধ্যমভিত্তিক প্রচারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য দল

প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তোলা হলেও সরকারের ওপর নির্বাচনের সময় নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো চাপ না থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সরকার পতনের আগে-পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিকরা বিদেশে পালিয়ে যান। এর পর থেকেই তারা রাজনীতিতে দৃশ্যমান নেই। তবে সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন সময় ভিডিও বার্তা ও সাক্ষাৎকারে বিভ্রান্তিমূলক ও প্ররোচণামূলক বার্তা প্রচার করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। এছাড়া সরকার পতনের পর কয়েকটি জেলায় শেখ হাসিনার সমর্থনে বিক্ষোভ হয় এবং সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলা করা হয়।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ফেসবুকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় দেশে ন্যায়বিচার ও বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা নেই এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। এছাড়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা বিক্ষোভ করেন। বাংলাদেশে হিন্দু এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ এনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন ক্যাম্পেইন চালু করা হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ও তার পরিষদসহ সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত একজন সাবেক সিটি কর্পোরেশন মেয়রের পক্ষ থেকে। শহীদ নূর হোসেন দিবসকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দিলেও তা ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অন্যদিকে একটি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির কাছে সমঝোতা প্রস্তাবের কথা বলেছেন একজন পলাতক নেতা।

ভিডিও বার্তা ও সাক্ষাৎকারে বিভ্রান্তিমূলক ও প্ররোচণামূলক বার্তার কয়েকটি উদাহরণ

- "আওয়ামী লীগকে শেষ করা সম্ভব নয়"।
- "ভারত আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচন নিশ্চিত করবে"।
- "শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেননি এবং তিনি এখনো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী"।
- "আওয়ামী লীগ পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেবে এবং এই নির্বাচন তিন মাসের মধ্যে হতে হবে"।
- "আটক করার হুমকি শেখ হাসিনাকে কখনো বিচলিত করেনি এবং তিনি কোনো ভুল করেননি"।
- "বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা করতে শেখ হাসিনা কাউকে কোনো নির্দেশ দেননি"।
- "গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে শেখ হাসিনা আবার দেশে ফিরবেন"।

দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ পাচার, কর্তৃত্ববাদী শাসন, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন, বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার বা কোনো প্রকার অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়নি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে।

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলন

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতেও সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা ভূমিকা পালন করেছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের পদত্যাগে বাধ্য করানো, আনসার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ফেরত দেওয়া, পুলিশের অনুপস্থিতিতে ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতার কাজ করা, পূর্বাঞ্চরের আকস্মিক বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, এবং বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বিনা লাভের দোকান' চালু করা। পরবর্তীতে বন্যার্তদের জন্য গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে ত্রাণ কার্যক্রমের হিসাবসংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনও তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, রাষ্ট্রপতি অপসারণের দাবি, উপদেষ্টা নিয়োগ, রাষ্ট্রীয় কার্যালয় থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো।

তবে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কিছু নেতিবাচক বিষয় লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও তাদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা ৮-১৮ সেপ্টেম্বর সময়ে ছাত্র-নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য দেশের ৪৪টি জেলা সফর করে। পরবর্তীতে রাষ্ট্র সংস্কারের নানা প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকায় মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। বাংলাদেশে রাজনীতি কীভাবে হবে সে বিষয়ে রূপরেখা তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তাদের কিছু মিত্র দলকে রাজনীতির বাইরে রাখতে এবং ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার আবেদন জানিয়ে আদালতে দুইটি পৃথক রিট আবেদন করে। তবে পরবর্তীতে রিট না চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দুজন গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রশক্তির সব কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পুরনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক কমিটি থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু করেছে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক পরিচয় ব্যবহার করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিতর্কিত ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যার মধ্যে রয়েছে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা, জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করা, এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের দাবিগুলোতে নিশ্চুপ থাকা। একদিকে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি, অন্যদিকে সরকার-সমর্থিত সংগঠনের মতো ভূমিকা পালন করার অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

নাগরিক সমাজ

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে নাগরিক সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সরকার গঠনের পরপর দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর অনতিবিলম্বে রাষ্ট্র সংস্কারসহ করণীয় বিষয়ক কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়নের আহবান জানিয়েছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আন্দোলনের সহিংস দমন ও বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জাতিসংঘের উদ্যোগে ন্যায়বিচার নিশ্চিতের আহবান জানিয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান ও জোট থেকে সরকারের জন্য বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের মূল্যায়ন/ সমালোচনাও করা হয়েছে, যার মধ্যে সরকারের তৎপরতা ও জোরালো কণ্ঠস্বরের ঘাটতি, আইন বিভাগের যথাযথ স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে না পারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি ও অস্বচ্ছতা, এবং 'মব জাস্টিস', মন্দির ও মাজার ভাংচুরের ঘটনায় কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যার মধ্যে আন্দোলনের পক্ষের ব্যক্তিকে আটক, একটি গোষ্ঠীর সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি বিলুপ্ত করার সমালোচনা করা উল্লেখযোগ্য। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়।

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। এছাড়া বাক ও চিন্তার স্বাধীনতাকে পুঁজি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারবিরোধী ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের সমর্থনে কোনো কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ঢালাওভাবে অপতথ্য, হেট-স্পিচ, গুজব ছড়ানো হয়েছে বলে দেখা যায়, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভক্তি, ভীতি ও দুশ্চিন্তার বিস্তার ঘটার জন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এসব দেশ ও সংস্থার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন, ইরান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার এবং সকল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীকে মুক্ত করা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মনোভাব ইতিবাচক হলেও প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফ এর মতো সংস্থার ঋণ সহায়তা-সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও বিশেষ করে ইতোমধ্যে সুদসহ ঋণ পরিশোধের অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর শেখ হাসিনা ও অন্যান্য কয়েকজন রাজনীতিক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলে বার্তা দেওয়া হয়। এই সময় ভারত বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় যার মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি, ঢাকায় কূটনৈতিক মিশন থেকে অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া, বাংলাদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়া, এবং ভিসা পরিষেবা সীমিত করা উল্লেখযোগ্য। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে যায়; তবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়।

নতুন সরকার বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করবে বলে ভারতের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়। তবে একইসাথে গণ-অভ্যুত্থানে বহিঃশক্তির ভূমিকা ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের (আওয়ামী লীগের) পক্ষের বয়ান প্রচার করা হয় ভারতের সরকার ও সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে। তাছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত সরকার। ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হয়। বাংলাদেশের কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'সীমান্ত হত্যা'র ঘটনা ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের বাস্তবতা মেনে নিতে ভারতের সরকার, রাজনীতিক ও গণমাধ্যম ব্যর্থ হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ১০০ দিনে সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত ও বিচার, আর্থিক খাত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এসব সিদ্ধান্ত/ উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার অংশ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়নের সুযোগ নেওয়া হয়নি বলে দেখা যায়, যা এখনো অনুপস্থিত। আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার বিচার প্রক্রিয়ায় অব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। সুনির্দিষ্ট ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক মামলা দায়ের করার উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ঢালাওভাবে শত শত মামলায় শত শত ব্যক্তিকে আসামী করার ফলে মূল অপরাধীর উপযুক্ত বিচারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

পদত্যাগের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন পুনর্গঠনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনসমূহের কার্যক্রম চলাকালীন অব্যবস্থা লক্ষণীয়। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও দায়িত্ব বণ্টনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হয়েছে। প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি দেখা যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারে দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দেখা যায়। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে, যদিও দলীয়করণের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত বিধায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি বাড়ছে বলে শঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে এক দলীয়করণের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের উদ্বেগ বিদ্যমান। পদোন্নতি/ পদায়নকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা গেছে।

কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও রাজনীতি থেকে নিবৃত থাকার ভূমিকাও ইতিবাচক। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার প্রশ্নে কোনো কোনো মহলের ধৈর্যের ঘাটতি লক্ষ করা যায় - তিন মাসেই সরকারের কার্যক্রম নিয়ে কোনো কোনো মহল হতাশা প্রকাশ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দলবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান দেখা যায়, যা একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও দলীয়করণের পরিবর্তে আরেকটি দলীয়করণের প্রতিস্থাপন/ হাতবদল বলে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গেছে।

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যায়নি, যা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। বিএনপির পক্ষ থেকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন লক্ষ করা যায় - প্রথমে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার কথা বললেও পরবর্তীতে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি তুলেছে দলটি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান - অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার রাষ্ট্র সংস্কার হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান ও রাজনৈতিক সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন এবং বিভাজনের লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়।

কোনো কোনো গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলাসহ একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা, অন্যদিকে অনেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা এবং নির্বিচারে অ্যাক্রিডিটেশন বাতিলের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকি হিসেবে গণ্য করা যায়। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়।

ভারত কর্তৃক কর্তৃত্ববাদ পতনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকারে ব্যর্থতার পাশাপাশি বরং উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করতে ভারত থেকে পতিত সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড লক্ষ করা গেছে। সর্বোপরি ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন সরকার ও দেশের জন্য উদ্বেগজনক। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রভাবশালী দেশ ও দাতা সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার আশ্বাস ও ঘোষণা এই সরকার তথা আন্দোলনের অভীষ্টের প্রতি আস্থার প্রকাশ। তবে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফ এর মতো সংস্থার ঋণ সহায়তা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি ও বিশেষ করে ইতোমধ্যে সুদসহ ঋণের ভারে জর্জরিত দেশবাসীর ওপর অতিরিক্ত বোঝার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে।

****